ইমারাহ ও খিলাফাহ : পরিচিতি, বিধান ও পার্থক্য

ইমারাহর প্রকারভেদ

ইমাম ইবনু জামাআহ রহ. তাহরিরুল আহকাম গ্রন্থে লেখেন :

الإمارة قسمان: عامة وخاصة. أما الإمارة العامة: فهي الخلافة.

ইমারাহ দুই প্রকার : সাধারণ ও বিশেষ। সাধারণ ইমারাহ হলো খিলাফাহ।[1]

সুতরাং বোঝা গেল, ইমারাহ শব্দটি খিলাফাহ শব্দের তুলনায় ব্যাপক। ইমারাহ শব্দের একটি ব্যবহার হলো খিলাফাহর সমার্থক। তবে ইমারাহ শব্দটি খিলাফাহ ছাড়া অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন এর দ্বারা সাধারণ ইমারাহ নয়; বরং বিশেষ ইমারাহ উদ্দেশ্য হয়।

ইমারাহ্‌র বিধান

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

হে ইমানদাররা, তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের ও তোমাদের মধ্যে যারা ইমারাহর অধিকারী তাদের।[2]

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

তাদের কাছে যখন কোনো সংবাদ আসে—তা শান্তির হোক বা ভীতির—তারা তা (যাচাই না করেই) প্রচার শুরু করে দেয়। তারা যদি তা রাসুল বা যারা ইমারাহর অধিকারী, তাদের কাছে নিয়ে যেত, তবে তাদের মধ্যে যারা তার তার তথ্য অনুসন্ধানী তারা তার বাস্তবতা জেনে নিত।[3]

উপরিউক্ত আয়াত দুটো দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে ইমারাহ্‌র অধিকারী ব্যক্তিবর্গ থাকবে। আল্লাহ তাআলা মুসলিম জনসাধারণের ওপর যাদের আনুগত্য করার এবং সংশয়পূর্ণ বিষয় যাদের দিকে ন্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর স্বীকৃত মূলনীতি হলো, কুরআনে যখন আদেশবাচক ক্রিয়া ব্যবহার হয়, তখন সাধারণভাবে তা অপরিহার্যতা বোঝায়। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ থাকতে হবে, যে তাদের আমির হবে। আর জনসাধারণের ওপর অপরিহার্য হবে তার আনুগত্য করা। তবে আমিরের আনুগত্য নিঃশর্ত হবে না; বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের অধীন হবে। যার কারণে আল্লাহ ও রাসুল শব্দদ্বয়ের গুরুত্ব স্বতন্ত্রভাবে 'আনুগত্য করো' ক্রিয়াটি ব্যবহার করা হলেও 'তোমাদের মধ্যে যারা

ইমারাহর অধিকারী তাদের' আনুগত্য নির্দেশ করার জন্য 'আনুগত্য' শব্দটির পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, মূলত আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের। আমির যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতিনিধিত্ব করে, তখন তার আনুগত্য মূলত আল্লাহ ও তাঁর রাসুলেরই আনুগত্য হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে আমির বানিয়ে নেয়।[4]

আল্লামা শাওকানি রহ. বলেন :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ إلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَإِذَا شُرِّعَ هَذَا لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ أَوْ يُسَافِرُونَ فَشَرْعِيَّتُهُ لِعَدَدٍ أَكْثَرَ يَسْكُنُونَ الْقُرَى وَالْأَمْصَارَ وَيَحْتَاجُونَ لِدَفْعِ التَّظَالُمِ وَفَصْلِ التَّخَاصُمِ أَوْلَى وَأَحْرَى، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَصْبُ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ وَالْحُكَّامِ. وَقَدْ ذَهَبَ الْأَكْثَرُ إلَى أَنَّ الْإِمَامَةَ وَاجِبَةٌ.

আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা. থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তিনজন ব্যক্তি যদি পৃথিবীর কোনো প্রান্তরে থাকে তাহলে তাদের জন্য একজনকে আমির বানানো ছাড়া বসবাস বৈধই হবে না।' ইমাম আহমদ রহ. হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। মাত্র তিনজন ব্যক্তি কোনো প্রান্তরে থাকলে বা সফরে বের হলে তাদের জন্যই যখন আমির নির্ধারণ করার বিধান শরিয়াহয় বিধিবদ্ধ হলো তখন বিপুল সংখ্যক মানুষ যদি মফস্বলে বা নগরে বসবাস করতে থাকে এবং তারা পারস্পরিক অত্যাচার প্রতিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদ সমাধানের দিকে মুখাপেক্ষী থাকে—তাদের জন্য এই শরিয়াহসিদ্ধি তো আরও অধিক উপযুক্ত ও সমীচীন। এই হাদিসে সেসব ইমামের বক্তব্যের দলিল রয়েছে, যারা বলেন, মুসলমানদের ওপর শাসক, প্রশাসক ও বিচারক নিযুক্ত করা ওয়াজিব। আর অধিকাংশ আলিমই এই মত পোষণ করেছেন যে, শাসনকার্য ওয়াজিব।[5]

ইমাম শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন :

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وِلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ؛ بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ وَلَا لِلدُّنْيَا إلَّا بِهَا.

জেনে রাখা অপরিহার্য, মানুষের বিষয়আশয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করা দীনের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিবসমূহের মধ্যে অন্যতম। বরং দীন ও দুনিয়া কোনোটাই এ ছাড়া চলতে পারে না।[6]

সুতরাং ব্যাপক অর্থে ইমারাহর অপরিহার্যতা কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত।

আমিরুল মুমিনিন

আমিরুল মুমিনিন ও খলিফাতুল মুসলিমিন শব্দ দুটো সমার্থক। আমিরুল মুমিনিন উপাধিটি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। তার পর থেকে এ দুটো শব্দ সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং সাধারণ আমির শব্দের তুলনায় আমিরুল মুমিনিন শব্দটি ব্যাপক। একটি খিলাফাহভিত্তিক রাষ্ট্রের অধীনে অনেক ইমারাহ থাকতে পারে। যেমন, উমর রা.-এর যুগে ইয়েমেন, শাম এবং মিশরে ইমারাহ ছিল। তবে তা স্বতন্ত্র ছিল না; বরং কেন্দ্রীয় ইমারাহর নেতৃত্বেই তা পরিচালিত হতো। আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ইমারাহয় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকত; যাদেরকে 'আমির' বা 'ওয়ালি' ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হতো। এ থেকে প্রতিভাত হয় যে, আমিরুল মুমিনিন একজনই হন। তবে তার অধীনে আরও অনেক আমির থাকতে পারে, যারা হবে তার প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত।

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বিধান

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের সর্বসম্মত মত হলো, মুসলমানদের জন্য খলিফা থাকা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবি, মাওয়ারদি, নববি এবং ইবনু হাজম রহ. প্রমুখ বিদগ্ধ আলিমগণ উম্মাহর ইজমা বর্ণনা করেছেন।[7] প্রতিটি ইজমার ভিত্তি হয় কুরআন ও সুন্নাহ। খিলাফার প্রতিষ্ঠা উম্মাহর ওপর অপরিহার্য—এই মাসআলার ওপর গোটা উম্মাহ যে ঐকমত্য পোষণ করেছে, এর পেছনে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর দলিল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত দলিলগুলোর পাশাপাশি এই হাদিসটিও এক সুদৃঢ় ভিত্তি :

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার গলায় কোনো বাইয়াত নেই, সে জাহিলি মৃত্যু বরণ করল।[8]

হাদিসে উল্লেখিত 'বাইয়াত' দ্বারা খলিফার উদ্দেশে প্রদত্ত বাইয়াত উদ্দেশ্য। এই সহিহ হাদিসের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মুসলমানদের কোনো একজন খলিফা থাকতে হবে। যেই যুগে মুসলমানদের কোনো খলিফা থাকবে না, তা হবে জাহিলি যুগ। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এখানে একটা প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, যে যুগে মুসলমানদের কোনো খলিফা থাকে না, সে যুগে যারা মারা যাবে, তারা সবাই কি জাহিলি মৃত্যু বরণ করবে? আমরা উত্তরে বলব, না, যদি খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের জন্য তাদের যথাযথ প্রচেষ্টা থাকে, তাহলে তাদের মৃত্যু জাহিলি মৃত্যু হবে না ইনশাআল্লাহ। খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা বাস্তবায়িত হবে—যারা দীনের বিজয় ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের প্রাণ, সম্পদ ও সর্বস্ব উৎসর্গ করে আল্লাহর পথে তাগুতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে বাইয়াত প্রদান করার মাধ্যমে। তবে আমরা এই বাইয়াতকে ওয়াজিব বলি না। আমরা বলি, আশা করা যায়, এই বাইয়াত আল্লাহর কাছে ওজর হিসেবে বিবেচিত হবে। বান্দা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে, 'হে আমার প্রতিপালক, যারা পৃথিবীতে খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সংগ্রামরত ছিল, তাদেরকে বাইয়াত দেওয়ার মাধ্যমে আমি আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছি। সুতরাং

তুমি আমার অপারগতা ক্ষমা করো, আমার ত্রুটি মার্জনা করো।' হাদিসে যে জাহিলি মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে—এটা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে খলিফা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরিয়াহর দৃষ্টিতে বিবেচ্য কোনো অপারগতা ছাড়া তাকে বাইয়াত দেওয়া থেকে বিরত থেকেছে। আর এখানে বাইয়াত দেওয়া দ্বারা খলিফার বাইয়াত সংঘটিত হওয়া এবং বৈধ সব বিষয়ে তার আনুগত্য অপরিহার্য হওয়ার বিশ্বাস লালন করা উদ্দেশ্য। কারণ, দারুল ইসলামে খলিফা হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের বাইয়াত গ্রহণ করা শর্ত নয়, এমনকি বর্তমানকালে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তা সম্ভবও নয়।

খলিফার শর্তাবলি

খলিফার শর্তাবলি নিম্নরূপ :

মুসলিম হওয়া।[9]

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।[10]

সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।[11]

স্বাধীন হওয়া।[12]

পুরুষ হওয়া।[13]

ন্যায়পরায়ণ হওয়া।[14]

কুরাইশ বংশের হওয়া।[15] তবে একান্ত কুরাইশ বংশের যোগ্য কাউকে না পাওয়া গেলে অন্য কেউও খলিফা হতে পারবে।[16]

লোভী, প্রার্থী বা ক্ষমতালিপ্সু না হওয়া।[17]

উপরিউক্ত শর্তগুলো সর্বসম্মত। সুতরাং এর কোনোটি অবিদ্যমান থাকলে ব্যক্তি খলিফা হওয়ার যোগ্য থাকে না। আর দুটো শর্ত রয়েছে মতবিরোধপূর্ণ :

ইজতিহাদের যোগ্য হওয়া। ইমাম শাতেবি[18], ইমাম রামালি[19] রহ. প্রমুখ ফকিহগণের মতে খলিফা হওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত। তবে ইমাম শাহরাসতানি[20], ইমাম গাজালি[21] রহ. প্রমুখ বিদগ্ধগণের মতে এটা শর্ত নয়। তবে তাদের মতানুসারে খলিফা নিজে যদি মুজতাহিদ না হন তাহলে নিদেনপক্ষে তার এতটুকু ইলম থাকা বাঞ্ছনীয়, যতটুকু একজন শাসকের ইসলামি তরিকায় শাসনকার্য চালানোর জন্য জরুরি আর এক্ষেত্রে তার সঙ্গে আলিম ও ফকিহ উপদেষ্টা থাকা অপরিহার্য, শরয়ি বিষয়াদিতে যার পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা অনুসারে তিনি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া। অর্থাৎ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও আত্মা সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া; যাতে তিনি শাসন ও বিচারকার্য, রাজনীতি ও সমর সবকিছুই সুচারুরূপে পরিচালনা করতে সক্ষম হন। ইমাম মাওয়ারদি[22] ও ইমাম আবু ইয়ালা[23] রহ. এ শর্তটির কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এটা কোনো সর্বসম্মত শর্ত নয়। সুতরাং এটাকে চূড়ান্ত অপরিহার্য বলাও সমীচীন নয়।

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি

খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানার জন্য আমরা প্রথমে ফিরে যাই খিলাফাতে রাশিদার যুগে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তার আদর্শ ও তার মহান খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। চার খলিফার নির্বাচন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল এই :

ক. আবু বকর রা. নির্বাচিত হয়েছিলেন সাহাবিদের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনের দ্বারা। প্রথমে সাকিফায় আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ[24] সাহাবিরা তাকে খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। এরপর মসজিদে সাধারণ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

খ. আবু বকর রা. মৃত্যুর পূর্বে উমর রা.-কে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। পরবর্তীতে তার তিরোধানের পর উমর রা. স্থলাভিষিক্ততার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেন। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরাও তাকে মেনে নেন। পরবর্তীতে মসজিদে মুসলিম জনসাধারণের কাছ থেকে সাধারণ বাইয়াত নেওয়া হয়।

গ. উমর রা. তার শাহাদাতের পূর্বে ছয় সদস্যবিবিশিষ্ট একটি শুরা পরিষদ গঠন করে দিয়ে যান। পরবর্তীতে তারা উসমান রা.-এর ব্যাপারে একমত হয়ে তাকে খলিফা হিসেবে মনোনীত করেন আর মুসলিম জনসাধারণ তাকে বাইয়াত দেয়।

ঘ. উসমান রা.-এর শাহাদাতের পর অনেক প্রবীণ সাহাবির পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলি রা. মসজিদে মুসলিম জনসাধারণের থেকে সাধারণ বাইয়াত গ্রহণ করেন। সে সময় তালহা ও জুবায়ের রা.-এর মতো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ সাহাবিরাও তাকে বাইয়াত প্রদান করেন। ফলে তিনি খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। তার নির্বাচনপদ্ধতি আবু বকর রা.-এর নির্বাচনপদ্ধতির মতোই ছিল।

সুতরাং সাহাবিদের জীবনী থেকে আমরা খলিফা নির্বাচনের তিন ধরনের পদ্ধতির কথা জানতে পারি। ইমাম নববি রহ. বলেন :

وَأَجْمَعُوا عَلَى انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ وَعَلَى انْعِقَادِهَا بِعَقْدِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِإِنْسَانٍ إِذَا لَمْ يَسْتَخْلِفِ الْخَلِيفَةُ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ جَعْلِ الْخَلِيفَةِ الْأَمْرَ شُورَى بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِالسِّتَّةِ

এ ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা রয়েছে যে, স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করার দ্বারা খিলাফাহ সম্পন্ন হয়। আর খলিফা যদি কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে না যান, তাহলে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনের দ্বারাও তা সম্পন্ন হয়। এবং তারা আরও ইজমা করেছেন যে, পূর্ববর্তী খলিফার জন্য পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব কোনো জামাআতের মধ্যে পরামর্শের বিষয় হিসেবে রেখে যাওয়াও জায়িয; যেভাবে উমর রা. ছয় সদস্যের পরামর্শ পরিষদ গঠন করে রেখে গিয়েছিলেন।[25]

খলিফার বাইয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য কি মুসলমানদের ঐকমত্য ও আন্তরিক সন্তুষ্টি শর্ত?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, খলিফার বাইয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য শর্ত নয়। আলি রা.-কে তার সময়ে সকল মুসলমান বাইয়াত দেয়নি। এমনকি অনেক প্রবীণ সাহাবিও তাকে বাইয়াত দেননি। এতদ্‌সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর চতুর্থ খলিফা ছিলেন। ইমাম জুওয়াইনি রহ. আল-গিয়াসি গ্রন্থে লেখেন :

مما نقطع به أن الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع.

যে কথাটা আমরা অকাট্যতার সঙ্গে বলব তা হলো, সর্বসম্মতিক্রমে খিলাফাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য সকলের ঐকমত্য শর্ত নয়।[26]

তবে এটা ঠিক যে, খলিফার বাইয়াত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অধিকাংশ মুসলিমের ঐকমত্য থাকা শর্ত; যাতে করে সকলের দ্বারা মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় প্রতাপ ও সুসংহত প্রতিরক্ষা-শক্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ইমাম জুওয়াইনি রহ. লেখেন :

الشوكة لا بد من رعايتها، ومما يؤكد ذلك اتفاق العلماء قاطبة على أن رجلا من أهل الحل والعقد لو استخلى بمن يصلح للإمامة وعقد له البيعة لم تثبت الإمامة.

শক্তির প্রতি লক্ষ করার কোনো বিকল্প নেই। এ বিষয়টিকে আরও সুদৃঢ় করে সকল আলিমের ঐকমত্য। কারণ, তারা ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি যদি খিলাফাহর যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে একান্তে নিয়ে তাকে বাইয়াত প্রদান করে, তাহলে তার জন্য খিলাফাহ সাব্যস্ত হবে না।[27]

খিলাফাহ সম্পন্ন হওয়ার জন্য মুসলমানদের আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা শর্ত। কারণ, খলিফাকে নির্বাচন করেছে মুসলমানরাই। সুতরাং এটা মূলত তার মাঝে ও মুসলমানদের মাঝে পারস্পরিক চুক্তি। আর পারস্পরিক চুক্তি সম্পন্ন হয় আন্তরিক সন্তুষ্টির সঙ্গে; বাধ্যতা ও জোরের সঙ্গে নয়।

قَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ العَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ... مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ

আবদুর রহমান ফিরে এসে বললেন, যদি আপনি ওই লোকটিকে দেখতেন, যে লোকটি আজ আমিরুল মুমিনিনের কাছে এসেছিল এবং বলেছিল, হে আমিরুল মুমিনিন, অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কিছু করার আছে কি, যে লোকটি বলে থাকে যে, যদি উমার মারা যান তাহলে অবশ্যই অমুকের হাতে বাইয়াত করব। আল্লাহর কসম, আবু বকরের বাইয়াত আকস্মিক ব্যাপার-ই ছিল। ফলে তা হয়ে যায়। এ কথা শুনে তিনি ভীষণভাবে রাগান্বিত হলেন। তারপর বললেন, ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যায় আমি অবশ্যই লোকদের মধ্যে দাঁড়াব আর তাদেরকে ওইসব লোক থেকে সতর্ক করে দেবো, যারা তাদের বিষয়াদি আত্মসাৎ করতে চায়।... যে-কেউ মুসলিমদের পরামর্শ ছাড়া কোনো লোকের হাতে বাইআত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং ওই লোকেরও না, যে তার অনুসরণ করবে। কেননা, উভয়েরই হত্যার শিকার হবার আশংকা রয়েছে।[28]

উমর রা. বলেন :

مَنْ بَايَعَ أَمِيرَ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ فَلَا بَيْعَةَ لَهُ

যে ব্যক্তি কোনো পরামর্শ ছাড়া মুসলমানদের সার্বিক দায়-দায়িত্বের বাইয়াত প্রদান করবে, তার বাইয়াত হবে না।[29]

হাফিজ ইবনু হাজার রহ. বলেন, 'ঘটনাটির প্রেক্ষাপট থেকে প্রতিভাত হয় যে, উমর রা.-এর আপত্তি ওই ব্যক্তির ওপর ছিল, যে মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে বাইয়াত দিতে চেয়েছে।'[30]

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হলো যে, খলিফা যদি নির্বাচিত হয় তাহলে তার নির্বাচন হতে হবে মুসলমানদের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। কিন্তু ওপরে আমরা দেখেছি, খলিফা নির্বাচনের একমাত্র পদ্ধতি এটা নয়; বরং তিনি পূর্ববর্তী খলিফার মনোনয়নের দ্বারাও নির্ধারিত হতে পারেন।[31] যেমন, সহিহ হাদিসে এসেছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: «إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ: «رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ، لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلاَ مَيِّتًا«

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার রা.-কে বলা হলো, আপনি কি (আপনার পরবর্তী) খলিফা মনোনীত করে যাবেন না? তিনি বললেন, যদি আমি খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—অর্থাৎ আবু বকর—তিনি খলিফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন । আর যদি মনোনীত না করি, তাহলে আমার চেয়ে যিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন—অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ—তিনি খলিফা মনোনীত করে যাননি। এতে লোকেরা তাঁর প্রশংসা করল। তারপর তিনি বললেন, কেউ এ ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী আর কেউ ভীত। আর আমি পছন্দ করি, আমি যেন এ থেকে মুক্তি পাই সমানে সমান—না পুরস্কার না শাস্তি। আমি জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে এর দায়িত্ব বহন করতে পারব না।[32]

খলিফা যদি পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রেও মুসলমানদের ঐকমত্য ও সন্তুষ্টি থাকা শর্ত। ইমাম আবু ইয়ালা রহ. লেখেন :

الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنما تنعقد بعهد المسلمين.

কেবল দায়িত্ব প্রদানের দ্বারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য খিলাফাহ সম্পন্ন হবে না; বরং তা সম্পন্ন হবে মুসলমানদের শপথের দ্বারা।[33]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. লেখেন :

وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه. ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما.

আবু বকর রা. যখন উমর রা.-এর উদ্দেশে দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন, এরপর তিনি তখনই খলিফা হিসেবে নির্ধারিত হয়েছেন যখন মুসলমানরা তাকে বাইয়াত দিয়েছে এবং তার আনুগত্য মেনে নিয়েছে। যদি এমন হতো যে, মুসলমানরা আবু বকর রা.-এর মনোনয়ন কার্যকর না করতেন এবং তাকে বাইয়াত না দিতেন, তাহলে তিনি খলিফা হতে পারতেন না।[34]

তিনি আরও লেখেন :

عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم، بل بمبايعة الناس له.

কিছু মানুষের নির্বাচনের দ্বারাই উসমান রা. খলিফা হয়ে যাননি; বরং তিনি মুসলিম জনসাধারণের বাইয়াতের দ্বারা খলিফা হয়েছেন।[35]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি যখন মুসলমানদের ওপর জোর খাটিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়, ফিতনা এড়ানোর স্বার্থে তাকেও খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া হয়।[36] তবে এটা খলিফা নির্ধারণের কোনো আদর্শ পদ্ধতি নয় এবং তা নববি ধারার খিলাফাহও নয়। এখানে আমাদের আলোচনা নববি ধারার খিলাফাহ তথা খিলাফাতে রাশেদা সম্পর্কে; জোরপূর্বক দখলকৃত স্বেচ্ছাচারপূর্ণ খিলাফাহ সম্পর্কে নয়।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ কারা?

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হচ্ছে আলিম-উলামা, মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ, সমাজের নেতাগণ এবং বড় ব্যবসায়ীগণ।[37] নারী, চুক্তিবদ্ধ কাফির ও দাসরা যতই মহৎ গুণের অধিকারী হোক না কেন, তারা কখনো আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণ, আয়িশা রা.-এর মতো বিদগ্ধ ফকিহ ও ফাতিমা রা.-এর মতো জান্নাতের সর্দার নারীর সঙ্গে সাহাবিগণ খলিফা নির্বাচণ বিষয়ে পরামর্শ করেননি। তাদেরকে শুরা বা আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ তাদের মর্যাদ, বিশেষত আয়িশা ও ফাতিমা রা.-এর পূর্ণাঙ্গতা হাদিস দ্বারা স্বীকৃত।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যারা হবেন, তাদের ক্ষেত্রে বিবেচ্য শর্ত হলো :

একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার জন্য তার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণ থাকা অপরিহার্য—যেমন, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি—আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই তা থাকা অপরিহার্য।

এই পরিমাণ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য, যার দ্বারা খিলাফাহর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারণ করতে পারেন।

যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা ও পর্যাপ্ত হিকমাত তথা প্রজ্ঞা, সচেতনতা ও বিচক্ষণতা থাকাও অপরিহার্য।

আস্থাবান ও নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি, যাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে পুরো জাতি সহজেই ঐকমত্য প্রদর্শন করে এবং যাদের নির্বাচন সকলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেয়।

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। প্রয়োজন ও বাস্তবতা অনুসারে তার সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ যেহেতু সমাজের সব শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাদেরও রুচিশীল, সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সব গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে নির্ধারণ করা হয়; যাতে করে তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জাতির কোনো দ্বিধা না থাকে। বাইয়াতের বাক্যমালা ছিল সাধারণত এরকম :

بايعناك راضين على إِقَامَة الْعدْل وَالْقِيَام بفروض الْإِمَامَة على كتاب الله وَسنة رَسُوله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]

আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনার হাতে বাইয়াত করছি এর ওপর যে, আপনি কুরআন ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ মোতাবেক খিলাফাহর দায়িত্বসমূহ পালন করবেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন।[38]

বিশিষ্ট ইমারাহ

বিশেষ ইমারাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি জামাআতসমূহের ইমারাহ। দীনের সাহায্য, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধের ব্যাপারে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকা সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না।[39]

তিনি আরও বলেন :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং বিক্ষিপ্ত হয়ো না।[40]

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

তোমরা দীন প্রতিষ্ঠা করো এবং এক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ো না।[41]

সুতরাং দীন প্রতিষ্ঠিত হবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি দ্বারা। তবে দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পন্থা কী হবে? শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَلَنْ يَقُومَ الدِّينُ إِلَّا بِالْكِتَابِ وَالْمِيزَانِ وَالْحَدِيدِ. كِتَابٌ يَهْدِي بِهِ وَحَدِيدٌ يَنْصُرُهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} فَالْكِتَابُ بِهِ يَقُومُ الْعِلْمُ وَالدِّينُ. وَالْمِيزَانُ بِهِ تَقُومُ الْحُقُوقُ فِي الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ والقبوض. وَالْحَدِيدُ بِهِ تَقُومُ الْحُدُودُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ.

দীন প্রতিষ্ঠিত হবে শুধু কিতাব, তুলাদণ্ড এবং লোহার দ্বারা। পথপ্রদর্শনকারী কিতাব এবং সাহায্যকারী লোহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বস্তুত আমি আমার রাসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।'[42] কিতাবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে জ্ঞান ও দীন। তুলাদণ্ডের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে আর্থিক লেনদেন ও করায়ত্তকরণের হকসমূহ। আর লোহার দ্বারা কাফির ও মুনাফিকদের ওপর দণ্ড প্রয়োগ হবে।[43]

আয়াতে তুলাদণ্ড বলে বোঝানো হয়েছে এমন বস্তুকে, যা দ্বারা কোনো জিনিস মাপা হয়। তা অবতীর্ণ করার অর্থ, আল্লাহ তাআলা তা সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তা দ্বারা ন্যায়ানুগ পরিমাপ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিগণ ও তাঁর কিতাবের সাথে তুলাদণ্ডের উল্লেখ দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, মানুষের উচিত তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও পরিমিতি রক্ষা করা। সেই ভারসাম্য ও পরিমিতির শিক্ষাই নবি-রাসুলগণের কাছে ও আসমানি কিতাবসমূহে পাওয়া যায়।

আর আয়াতে বিশেষভাবে লোহার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। লোহা এমনই এক ধাতু, সব শিল্পেই যার দরকার পড়ে। কাজেই এর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত। নবিগণ, আসমানি কিতাব ও তুলাদণ্ডের পর লোহার উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, মানবসমাজের সংস্কার-সংশোধনের প্রকৃত উপায় নবিগণের জীবনাদর্শ ও তাদের আনীত কিতাব। এর যথাযথ অনুসরণ দ্বারাই দুনিয়ায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু জগতে অপশক্তিও কম নেই, যা এসব শিক্ষা দ্বারা সমাজ-সংস্কারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে ব্যাহত করে এবং সর্বত্র অন্যায়-অনাচার ও দুষ্কর্মের বিস্তার ঘটিয়ে সমাজদেহকে কলুষিত করে। সেই সব অপশক্তির শিরোচ্ছেদের জন্য আল্লাহ তাআলা লোহা সৃষ্টি করেছেন। তা দ্বারা বিভিন্ন রকমের সমরাস্ত্র তৈরি হয় এবং পরিশেষে তা জিহাদে ব্যবহার করা যায়।

যেহেতু শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা ও ইসলামি খিলাফাহ পুনরুদ্ধার করা মুসলিম উম্মাহর ওপর অপরিহার্য, আর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি ছাড়া বাহ্যত তা সম্ভব নয়, এ জন্য এই মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে উম্মাহর জামাআতবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআত হয় না। কারণ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকলে কোনোভাবেই ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যায় না। জামাআতের মধ্যেই শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা যায় না। আমিরুল মুমিনিন উমর রা. বলেন :

إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ ، وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ ، وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ ، فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ ، كَانَ حَيَاةً لَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى غَيْرِ فِقْهٍ ، كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَلَهُمْ

জামাআত ছাড়া কোনো ইসলাম হয় না। ইমারাহ ছাড়া কোনো জামাআত হয় না। আর আনুগত্য ছাড়া কোনো ইমারাহ হয় না। সম্প্রদায় যাকে ফিকহের ভিত্তিতে নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য ও সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য প্রাণের সঞ্জীবনী হয়। আর যাকে তার সম্প্রদায় ফিকহ ছাড়া অন্য কিছুর ভিত্তিতে নেতা বানায়, সে তার নিজের জন্য ও তাদের সবার জন্য ধ্বংসের কারণ হয়।[44]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন :

وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ. وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا أَوْجَبَهُ مِنْ الْجِهَادِ وَالْعَدْلِ وَإِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ. وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالْقُوَّةِ وَالْإِمَارَةِ؛ وَلِهَذَا رُوِيَ: {أَنَّ السُّلْطَانَ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ}. وَيُقَالُ {سِتُّونَ سَنَةً مِنْ إمَامٍ جَائِرٍ أَصْلَحُ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ} . وَالتَّجْرِبَةُ تُبَيِّنُ ذَلِكَ.

যেহেতু আল্লাহ তাআলা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ অপরিহার্য করে দিয়েছেন, আর (রাষ্ট্রীয়) শক্তি ও ইমারাহ ছাড়া তা পরিপূর্ণ হয় না। একইভাবে আল্লাহ আরও যেসব বিষয় অপরিহার্য করেছেন—যেমন : জিহাদ, ন্যায়পরায়ণতা, হজ জুমআ ও ঈদ কায়েম করা, মাজলুমের সাহায্য করা এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা—এর কোনোটিই প্রতাপ ও ইমারাহ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। এ জন্যই বর্ণিত হয়েছে, শাসক পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়াস্বরূপ। কথিত আছে, শাসক ছাড়া যাপিত এক রাত অপেক্ষা জালিম শাসকের সঙ্গে ৬০ বছর যাপন করা অধিক উপযুক্ত। অভিজ্ঞতা এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করে তোলে।[45]

তিনি আরও বলেন :

وَأَمَّا " رَأْسُ الْحِزْبِ " فَإِنَّهُ رَأْسُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَتَحَزَّبُ أَيْ تَصِيرُ حِزْبًا فَإِنْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ فَهُمْ مُؤْمِنُونَ لَهُمْ مَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ. وَإِنْ كَانُوا قَدْ زَادُوا فِي ذَلِكَ وَنَقَصُوا مِثْلَ التَّعَصُّبِ لِمَنْ دَخَلَ فِي حِزْبِهِمْ بِالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّنْ لَمْ يَدْخُلْ فِي حِزْبِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَهَذَا مِنْ التَّفَرُّقِ الَّذِي ذَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَمَرَا بِالْجَمَاعَةِ والائتلاف وَنَهَيَا عَنْ التَّفْرِقَةِ وَالِاخْتِلَافِ وَأَمَرَا بِالتَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَنَهَيَا عَنْ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

মুমিনরা যে দলে আবদ্ধ হবে, সেই দলের একজন প্রধান থাকবেন। যদি তারা কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা কিছুর আদেশ করেছেন তার ভিত্তিতে দলবদ্ধ হয়, তাহলে তারা মুমিন। মুমিনদের জন্য যা কিছু প্রযোজ্য, তাদের জন্য তার সবকিছু প্রযোজ্য। মুমিনদের ওপর যা কিছু অবধারিত, তাদের ওপরও তার সবকিছু অবধারিত। তবে যদি তারা হ্রাস-বৃদ্ধি করে—যেমন, তাদের দলে যারা অন্তর্ভুক্ত হবে, হক ও বাতিল সব ব্যাপারে তাদের প্রতি সাম্প্রদায়িকতা লালন করে আর যারা তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে না, তারা হকের ওপর থাক বা বাতিলের ওপর, তাদেরকে উপেক্ষা করে—তাহলে এটা সেই বিভক্তি বলে বিবেচিত হবে, যার নিন্দা করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ জামাআত ও সম্প্রীতির আদেশ করেছেন। বিভক্তি ও মতবিরোধ থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের সহযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে কেউ কারও সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন।[46]

যখন পৃথিবীতে ইসলামি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন ইসলামের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত দীনি জামাআতসমূহের আমির তো সাধারণভাবে খলিফাই নির্ধারণ করে দেবেন। কিন্তু যখন ইসলামি খিলাফাহ থাকবে না কিংবা কোনো অপারগতার কারণে খলিফার সঙ্গে পরামর্শ করে তার সিদ্ধান্ত জানা সম্ভব হবে না, তখন মুসলমানদের ওপর কর্তব্য হবে পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনো একজনকে আমির হিসেবে মেনে নেওয়া।

খলিফার অনুপস্থিতিতে যে জিহাদ ও অন্যান্য দীনি জামাআত পরিচালনা করার জন্য মুমিনরা নিজেদের পক্ষ থেকেই আমির নির্ধারণ করে নিতে পারবে, এর সবচে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মুতা যুদ্ধের ঘটনা।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فَقَالَ: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ» وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ: «حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»

আনাস রা. থেকে বর্ণিত। নবি ﷺ-এর নিকট (মুতার) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই তিনি উপস্থিত মুসলমানদেরকে যায়দ, জাফর ও ইবনু রাওয়াহা রা.-এর শাহাদতের কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যায়দ রা. পতাকা হাতে অগ্রসর হলে তাঁকে শহিদ করা হয়। তখন জাফর রা. পতাকা হাতে অগ্রসর হলো, তাকেও শহিদ করে ফেলা হয়। তারপর ইবনু রাওয়াহা রা. পতাকা হাতে নিল। এবার তাকেও শহিদ করে দেওয়া হল। এ সময়ে তার দু-চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। (তারপর তিনি বললেন,) অবশেষে সাইফুল্লাহদের মধ্যে এক সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) হাতে পতাকা ধারণ করেছে। ফলত আল্লাহ তাদের ওপর (আমাদের) বিজয় দান করেছেন।[47]

আল্লাহ তাআলা সেই যুদ্ধে মুসলমানদেরকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিপ্রাপ্ত মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর হাতে মুসলমানদের বিজয় দান করেছিলেন। কিন্তু তাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমির হিসেবে মনোনীত করে পাঠাননি। তিনি সর্বমোট তিনজনকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাদের সবার শাহাদাতের পর মুসলমানরা সাবিত ইবনু আকরাম রা.-এর আহ্বানে নিজেরা পরামর্শক্রমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে নিজেদের আমির হিসেবে মনোনীত করে নেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . رضى الله عنهما . قَالَ أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيهِمْ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى، وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ.

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ ﷺ যায়দ ইবনু হারিসা রা.-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বলেছিলেন, যদি যায়দ রা. শহিদ হয়ে যায় তাহলে জাফর ইবনু আবু তালিব রা. সেনাপতি হবে। যদি জাফর রা.-ও শহিদ হয়ে যায় তাহলে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. সেনাপতি হবে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, ওই যুদ্ধে তাদের সাথে আমিও ছিলাম। যুদ্ধ শেষে আমরা জাফর ইবনু আবু তালিব রা.-কে তালাশ করলে তাকে শহিদগণের মধ্যে পেলাম। তখন আমরা তার দেহে তরবারি ও বর্শার ৯০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি।[48]

উপরিউক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনু হাজার রহ. ফাতহুল বারি গ্রন্থে লেখেন :

قال الطحاوي: هذا الأصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلاً إذا غاب الإمام يقوم مقامة إلى أن يحضر .وكذا قال الخطابي وعنه البغوي.

ইমাম তহাবি রহ. বলেন, এই মূলনীতি থেকে উদ্ঘাটিত হয় যে, ইমাম যখন অনুপস্থিত থাকবেন, তখন মুসলমানদের ওপর অন্য কোনো ব্যক্তিকে অগ্রসর করা অপরিহার্য হবে, যে ইমামের স্থলাভিষিক্ত হবে—যতক্ষণ না ইমাম উপস্থিত হয়। ইমাম খাত্তাবি রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন এবং তার সূত্রে বাগাবি রহ. এই কথা বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও লেখেন :

قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ أَيْ جَازَ ذَلِكَ... قَالَ ابن الْمُنِيرِ يُؤْخَذُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ مَنْ تعين لِوِلَايَةٍ وَتَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْإِمَامِ أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ لِذَلِكَ الْمُعَيَّنِ شَرْعًا وَتَجِبُ طَاعَتُهُ حُكْمًا كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إِذَا اتَّفَقَ الْحَاضِرُونَ عَلَيْهِ

ইমাম বুখারি রহ. অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন : 'শত্রুর আশঙ্কার কারণে যুদ্ধে যে ব্যক্তি খলিফার পক্ষ থেকে ইমারাহ্‌র দায়িত্ব ব্যতিরেকেই আমির হয়।' অর্থাৎ এটা বৈধ।... ইবনু মুনির রহ. বলেন, অধ্যায়ের হাদিস থেকে যে মাসআলা গৃহীত হয় তা হলো, যে ব্যক্তি নেতৃত্বের জন্য নির্ধারিত হয় আর তার ব্যাপারে ইমামের কাছে গিয়ে সিদ্ধান্ত জানা দুষ্কর হয়, শরিয়াহর দৃষ্টিতে সেই নির্ধারিত ব্যক্তির নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং বিধানগতভাবে তার আনুগত্য অপরিহার্য হবে। তবে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এটা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তার ব্যাপারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ একমত হবে।[49]

এর পক্ষে আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেই বাণী, যেখানে তিনি বলেছেন :

لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا، يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

এই দীন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, মুসলমানদের এক দল এর ওপর লড়াই চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়।[50]

لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

আমার উম্মাহর একটি দল আল্লাহর আদেশের ওপর সর্বদা লড়াই চালিয়ে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের পরাভূত করবে। যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না—যতক্ষণ না কিয়ামত আসে এবং তারা সেই অবস্থায় থাকে।[51]

এসব হাদিসের আলোকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকবে। কখনো তা বন্ধ হবে না। অথচ কিয়ামত পর্যন্ত যে খিলাফাহ থাকবে না, এটা অসংখ্য হাদিসের আলোকেই আমরা জানতে পারি। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

'অবশ্যই ইসলামের হাতলগুলো একে একে ভেঙে ফেলা হবে। যখন একটা হাতল ভাঙবে তখন লোকেরা এর পরবর্তী হাতল আঁকড়ে ধরে থাকবে। সর্বপ্রথম যে হাতলটি ভেঙে যাবে তা হলো শাসনক্ষমতা আর সর্বশেষটি হলো নামাজ।'[52]

হুজায়ফা রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ

তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে ততদিন পর্যন্ত যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, নবুওয়াত থাকুক। এরপর যখন তিনি তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। খিলাফাহ ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে দাঁত কামড়ে থাকা রাজত্ব। তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। এরপর আসবে জবরদস্তিমূলক রাজত্ব। তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন যে, তা থাকুক। এরপর যখন আল্লাহ তা উঠিয়ে নিতে চাইবেন তখন উঠিয়ে নেবেন। তারপর আবার প্রতিষ্ঠিত হবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।[53]

আনাস রা.-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّهَا نُبُوَّةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ خِلَافَةٌ وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ مُلْكٌ عَضُوضٌ، ثُمَّ جَبْرِيَّةٌ، ثُمَّ طَوَاغِيتُ

নিশ্চয়ই এখন রয়েছে নবুওয়াত ও রহমত। এরপর আসবে খিলাফাহ ও রহমত। তারপর আসবে দাঁত কামড়ে থাকা রাজত্ব। এরপর আসবে জবরদস্তি। তারপর তাগুতগোষ্ঠী।[54]

সুতরাং খলিফা বিদ্যমান না থাকলেও দীনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত জামাআতগুলোর আমির বিদ্যমান থাকবে। জামাআতের সদস্যরা নিজেরাই পারস্পরিক পরামর্শ ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাউকে আমির হিসেবে মনোনীত করবে। তাদের ওপর সেই

আমিরের আনুগত্য করা অপরিহার্য হবে। খলিফার অনুপস্থিতিতে পুরো দীনের সামাজিক সব কাজকর্মকে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর ফেলে রাখার কোনোই সুযোগ নেই। আর ইসলামি জামাআতগুলোর কর্তব্য হলো, পারতপক্ষে নিজেরা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত না হওয়া। বরং শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা ও খিলাফাহ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলিমরা এক ইমারাহর অধীনে এক ঝাণ্ডার ছায়াতলে কাজ করা।[55] তবে একান্ত যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ইমারাহর অধীনে লড়াই চালিয়ে যাওয়াও বৈধ হবে। কিন্তু এক অঞ্চলে একাধিক কিতালপন্থী জামাআত না থাকাই সমীচীন। অন্যথায় বিভিন্ন মতবিরোধকে কেন্দ্র করে লড়াই কুফফারের সঙ্গে সীমাবদ্ধ না থেকে অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে; যা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক ক্ষতিকারক।

আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ও অন্যান্য আমিরদের বাইয়াতের মধ্যে পার্থক্য

সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্মরণ রাখা জরুরি, দীনের সাহায্যে কর্মরত যেকোনো জামাআত মুসলমানদের একমাত্র জামাআত নয়; বরং মুসলমানদের জামাআতসমূহের মধ্য থেকে একটি জামাআত মাত্র। যার কারণে হাদিসে মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে যেসব শাস্তির হুঁশিয়ারি বর্ণিত হয়েছে, তা এসব জামাআত থেকে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। যেমন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে লোক নিজ আমিরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামাআত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে, তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলি মৃত্যুর মতো।[56]

উপরিউক্ত হাদিসটি আমিরুল মুমিনিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর তাতে যে জাহিলি মৃত্যুর কথা উল্লেখিত হয়েছে, এটা ওই ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য, যে আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত থেকে পৃথক হয়ে যায়।

আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ও অন্যান্য আমিরদের বাইয়াতের মধ্যে মোটা দাগে যে সকল পার্থক্য রয়েছে, তা নিম্নরূপ :

১. আমিরুল মুমিনিনকে প্রদত্ত বাইয়াত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহ ও একজন ব্যক্তির মধ্যে খিলাফাহ্‌র দায়িত্বের ব্যাপারে কৃত চুক্তি। পক্ষান্তরে অন্যান্য আমিরকে প্রদত্ত বাইয়াত হলো গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে নয়, বরং উম্মাহর নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো আনুগত্যের ব্যাপারে বিশেষ কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কৃত চুক্তি।

২. আমিরুল মুমিনিনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু শর্ত উপস্থিতি থাকা জরুরি। যেমন, কুরাইশ বংশের হওয়া বা ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকা। অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে সেসব শর্ত থাকা জরুরি নয়। সুতরাং কুরাইশী বা মুজতাহিদ না হওয়া সত্ত্বেও কেউ বিশিষ্ট আমির হতে পারে।

৩. আমিরুল মুমিনিনকে প্রদত্ত বাইয়াত গোটা উম্মাহর কল্যাণে কাজ করার জন্য এবং ইসলামের সর্বপ্রকার বিধিবিধানের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য হয়ে থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের ওপর তার আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়—যতক্ষণ না তার থেকে এমন কোনো দোষ প্রকাশ পায়, যা তার বাইয়াতকে রহিত করে দেয়। অপরদিকে অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের ওপর তাকে বাইয়াত দেওয়া হবে—যেমন : জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, মাজলুমের সাহায্য ইত্যাদি—তার ওপর কেবল সেই কাজেরই দায় বর্তাবে। কেননা, আমিরুল মুমিনিনের দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবেই শরিয়াহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর অন্যান্য আমিরদের ক্ষেত্রে তাকে যে বিষয়ের বাইয়াত দেওয়া হবে এবং যে শব্দে বাইয়াত দেওয়া হবে, তার ওপর শুধু তার দায়-দায়িত্বই বর্তায়।

৪. আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত সকল মুসলিমের ওপর অপরিহার্য থাকে। কেউ চাইলেও তার নির্দেশ অমান্য করার বা তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করার সুযোগ থাকে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

»كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ« قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ«

বনি ইসরাইলের নবিগণ তাদের উম্মাহকে শাসন করতেন। যখন কোনো একজন নবি মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবি তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবি নেই। তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক করে তাদের বাইয়াতের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ওই সকল বিষয়ে যে সবের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পন করা হয়েছিল।[57]

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার গলায় কোনো বাইয়াত নেই, সে জাহিলি মৃত্যু বরণ করল।[58]

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

'তুমি মুসলিমদের জামাআত ও ইমামকে আঁকড়ে থাকবে।'[59]

অন্যান্য আমিরের আনুগত্য সবার ওপর অপরিহার্য থাকে না। বরং যারা তাকে বাইয়াত দিয়েছে এবং যে বিষয়ের বাইয়াত দিয়েছে, কেবল তাদের জন্য সে বিষয়ে আনুগত্য করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন, জিহাদি জামাআতের আনুগত্য করা গোটা মুসলিম উম্মাহর ওপর অপরিহার্য হবে না। বরং সেই জামাআতের সদস্য যারা হবে, যারা তাকে বাইয়াত দেবে, তার আনুগত্য কেবল তাদের ওপরই অপরিহার্য হবে।

৫. আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্যের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। বরং তা সর্বদা অপরিহার্য থাকে। যতক্ষণ না আমিরুল মুমিনিন মৃত্যুবরণ করেন কিংবা তিনি আমিরুল মুমিনিন থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন, ততক্ষণ বিনা বাক্যব্যয়ে তার আনুগত্য করে যেতে হয়। অন্যান্য আমিরের ক্ষেত্রে আনুগত্যের বাইয়াত নির্দিষ্ট সময় বা কাজের সঙ্গে সীমাবদ্ধ হতে পারে। যখন সেই সময় শেষ হবে বা সেই কাজ সম্পন্ন হবে, তার পর আর তার আনুগত্য অপরিহার্য থাকবে না।

৬. একই সময়ে একাধিক আমিরুল মুমিনিন হতে পারে না। গোটা বিশ্বের ইমাম, খলিফা ও আমিরুল মুমিনিন হবেন মাত্র একজন। অন্যান্য আমিরদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুসারে তাতে ভিন্ন ভিন্ন আমির হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন জিহাদি জামাআতের আমির, একজন তাবলিগি জামাআতের আমির, একজন দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের আমির ইত্যাদি।

৭. যত হাদিসে মুক্তভাবে বাইয়াত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, সেসব হাদিস আমিরুল মুমিনিনের ব্যাপারে প্রযোজ্য। সুতরাং দীনি কোনো জামাআতের জন্য এসব হাদিসকে যথাস্থানে প্রয়োগ না করে ভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করা বৈধ নয়। যেমন, কিছু মানুষের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো বিষয়ে বাইয়াত লাভ করেই নিজেকে আমিরুল মুমিনিন মনে করা, আমিরুল মুমিনিনের জন্য নির্ধারিত হক ভোগ করা বা নিজেকে তার সমস্তরের মনে করা, কেউ বাইয়াত ভঙ করে দল ত্যাগ করলে তার বিরুদ্ধে এরূপ মন্তব্য করা—সে হত্যার উপযুক্ত বা সে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে জাহিলি মৃত্যু বরণ করবে প্রভৃতি।

তবে স্মর্তব্য যে, আমিরুল মুমিনিনের আনুগত্য যেমন ওয়াজিব, তেমনি অঙ্গীকারাবদ্ধ বিষয়গুলোতে অন্যান্য আমিরদের আনুগত্যও ওয়াজিব।[60] কারণ, কুরআনে আল্লাহ তাআলা অঙ্গীকার পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছেন।[61] শরিয়াহ বান্দার ওপর যা অপরিহার্য করেছে, তা মান্য করা যেমন ওয়াজিব; বান্দা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের ওপর যা অপরিহার্য করে নিয়েছে, তা মান্য করাও ওয়াজিব। এর সবচে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মানত।

৮. আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত ত্যাগ করলে তাকে বিদ্রোহী হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে তাকে আনুগত্য করতে বাধ্য করা হবে। পক্ষান্তরে জিহাদ ফরজ থাকা অবস্থায় কেউ যদি জিহাদি জামাআত পরিত্যাগ করে বা তা থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে, তাহলে সে যদিও গোনাহগার হবে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না এবং তার ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তাকে জোরপূর্বক আনুগত্য করতে বাধ্য করা যাবে না।

৯. বিশিষ্ট আমিরদের জামাআত থেকে ইস্তেফা ও অব্যাহতি নেওয়া বৈধ। কিন্তু আমিরুল মুমিনিনের বাইয়াত ভঙ করে মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ নয়।

বর্তমান সময়ে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবিত পথ

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার সম্ভাবিত পথ হলো দাওয়াত ও জিহাদ। প্রথমে একটি অগ্রগামী দল তৈরি করতে হবে, যাদের কাজ হবে 'সাপের মাথা' তথা বৈশ্বিক কুফরি শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলোর ওপর আক্রমণ করা। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে হবে কিংবা যেসব সশস্ত্র জিহাদি জামাআত আছে, তাদের সাথে মিলে কাজ করতে হবে। এই সব দলকে একটি বিশ্বব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্যে একীভূত করতে হবে। এই আঞ্চলিক দলগুলো নিজ নিজ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কার্যক্রম চালাবে। দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ করবে। মুসলিম উম্মাহর হারানো চেতনা জাগ্রত করবে এবং সবাইকে জিহাদের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে। মূল গেরিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে তারা সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি পপুলার সাপোর্ট বেস তৈরি করবে।

এরপর ক্ষেত্রবিশেষ প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তারা ভূমি দখল করবে এবং সেখানে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে। প্রতিটি শাখা মূল নেতৃবৃন্দের নির্দেশনা মেনে চলবে। প্রয়োজনে অন্যান্য ইসলামি দলের সাথে সহযোগিতা করবে। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি দাওয়াতের কাজও চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে আঞ্চলিক তাগুত বা কুফফারকে যথেষ্ট দুর্বল করতে পারলে এবং পর্যাপ্ত ভূমি নিয়ন্ত্রণে আসলে ইমারাহ গঠন করবে।

একই সাথে মূল শত্রু বৈশ্বিক কুফরি শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। একটি শক্তিক্ষয়ের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধে (Asymmetric war of attrition) কুফরের ধ্বজাধারী ও দাজ্জালি মিশন বাস্তবায়নকারী রাষ্ট্রসমূহকে জড়িয়ে রাখতে হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষমতা নিঃশেষ করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে সেসব রাষ্ট্রের সামরিক অভিযান চালানোর সক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে হবে।

এভাবে যখন বৈশ্বিক কুফরি শক্তির কেন্দ্র রাষ্ট্রগুলো মুসলিম বিশ্বে আগ্রাসন চালাতে এবং সামরিকভাবে বিভিন্ন ভূখণ্ডের তাগুতগোষ্ঠীকে সমর্থন করতে অপারগ হয়ে দাঁড়াবে, তখন শুরার মাধ্যমে, উম্মাহর আন্তরিক সন্তুষ্টি ও সম্মতির ভিত্তিতে খিলাফাহ ঘোষণা করা হবে।

এটা হলো দাওয়াত ও জিহাদের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে কোনো আঞ্চলিক ভূমি দখল করাই মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং আঞ্চলিক সংঘর্ষের চেয়ে বৈশ্বিক জিহাদের লক্ষ্যসমূহই এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে এখানে আঞ্চলিক তাগুতের আগে কুফরের ইমামদের ধ্বংস করাই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এর জন্য জনসমর্থনের ভিত্তিতে গেরিলা যুদ্ধকেই উম্মাহর জন্য সবচে বাস্তবসমত পন্থা মনে করা হয়।

খিলাফাহ ঘোষণা করার পর শরিয়াহর নির্দেশনা অনুসারে খলিফাকে আবশ্যিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে—সকল মুসলিমের হিজরতের জন্য খিলাফাহর ভূমিকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে এবং তাদের সবাইকে নিরাপত্তা দিতে হবে। ভাষা-বর্ণ-মতাদর্শ নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল মুসলিমের জন্যই এই সুযোগ থাকতে হবে। এর পাশাপাশি সকল নির্যাতিত মুসলিমের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে হয়তো একই সঙ্গে সকল জায়গায় সাহায্য পাঠানো সম্ভব হবে না, এতদ্‌সত্ত্বেও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে অবশ্যই পাঠাতে হবে। আর যে অঞ্চলগুলোতে সেনা পাঠানো যাবে না, সেখানকার

মুসলমানদের অর্থ, লোকবল এবং অস্ত্র দিয়ে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তো যতদিন পর্যন্ত খিলাফাহর এসব দাবি পূরণ করার মতো সামর্থ্য অর্জিত হবে না, ততদিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ইমারাহ্‌র মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে। শর্ত পূরণ না করেই তাড়াহুড়ার ভিত্তিতে খলিফা সেজে বসবে না। কারণ, খলিফা হওয়ার অর্থ হলো গোটা ইসলামি বিশ্বের অভিভাকত্বের আসনে আসীন হওয়া। সকল মুসলিমের দায় ও কর্তৃত্ব লাভ করা।

তবে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, জনগণ হলো পানি, যার মধ্যে গেরিলারূপী মাছ সাঁতরে বেড়ায়। সুতরাং জনসমর্থন ব্যতীত মুজাহিদদের অবস্থা হবে পানি ছাড়া মাছের মতো, যার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্য সামরিক সক্ষমতার পাশাপাশি জনসমর্থন তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; অনেক ক্ষেত্রে তা সামরিক সক্ষমতার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রথমে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এরপর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বা আদর্শিক ঐক্য গঠন করতে হবে। এবং ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধ ও শত্রুর ধ্বংসের দিকে মনোনিবেশ করা হবে। যার কারণে চূড়ান্ত সম্মুখ যুদ্ধে যাওয়ার আগে অবশ্যই মুজাহিদদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি জনসমর্থন সৃষ্টি করতে হবে। এর মাধ্যমে শক্তি, সামর্থ্য ও সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। আর এক্ষেত্রে গোপনে নিজেদের প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। বিভিন্ন দলের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততাও গোপন রাখতে হবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের আগে মিডিয়াতে প্রচারিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, কোনো ভূখণ্ড নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আসলে সেখানে তো অনতিবিলম্বে শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু ইমারাহ ঘোষণা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। নির্দিষ্ট পর্যায়ের স্থিতিশীলতা ও প্রতিরোধশক্তি অর্জিত হওয়ার আগে ইমারাহ ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় কৌশলগত কারণে কখনো সেই ভূমি থেকে মুজাহিদরা পিছু হটলে এবং সেখানে কিছুদিন পর ইমারাহ্‌র নাম-গন্ধ না থাকলে জিহাদ ও মুজাহিদ সম্পর্কে মানুষের ধারণা মন্দ হয়ে যাবে। আর কখনোই এই লড়াইকে কুফফার বনাম নিজেদের দলের লড়াই হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না; বরং এটাকে উপস্থাপন করতে হবে কুফফার বনাম মুসলিম উম্মাহর লড়াই হিসেবে। যাতে করে মুসলমানরা সবাই এটাকে নিজেদের সংগঠন মনে করে; নিজেদের থেকে আলাদা বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো দল ভেবে না বসে। এ জন্য জিহাদি আন্দোলনের উচিত সে শত্রুকে আক্রমণ করা, যার কুফর সর্বাধিক প্রকাশ্য; সে শত্রুকে নয়, যার কুফরের পরিমাণ সর্বাধিক।

তথ্যসূত্র:

[1] তাহরিরুল আহকাম : ৭৯

[2] সুরা নিসা : ৫৯

[3] সুরা নিসা : ৮৩

[4] সুনানু আবি দাউদ : ২৬০৮, ২৬০৯; সহিহ ইবনু খুজায়মা : ২৫৪১

[5] নাইলুল আওতার : ৮/২৯৪

[6] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৩৯০

[7]দ্রষ্টব্য—আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি : ১/২৬৪; আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ৫; শরহু সহিহ মুসলিম, নববি : ১২/২০৫; আল-ফাসল, ইবনু হাজম : ৪/৮৭। প্রয়োজনে আরও দেখুন—শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. রচিত ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, আল্লামা তাফতাজানি রহ. রচিত শারহুল আকায়িদ এবং মাওলানা ইদরিস কান্ধলবি রহ. রচিত আকায়েদুল ইসলাম।

[8] সহিহ মুসলিম : ১৮৫১

[9] সুরা নিসা : ৪১; সুরা নিসা : ৫৯; আহকামু আহলিয যিম্মাহ, ইবনুল কায়্যিম : ২/৭৮৭; শরহু সহিহ মুসলিম, নববি : ১২/২২৯

[10] সুরা নিসা : ৫; আল-ফাসল, ইবনু হাজম : ৪/৮৯

[11] মারাতিবুল ইজমা, ইবনু হাজম : ১৫৪

[12] ফাতহুল বারি : ২০/১৬০

[13] আল-ফাসল, ইবনু হাজম : ৪/৮৯

[14] আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবি : ১/২৭০

[15] সহিহ বুখারি : ৭১৩৯, ৭১৪০; মুসনাদু আহমাদ : ২০/২৪৯; শরহু সহিহ মুসলিম : ১২/২০০

[16] মুসনাদুল বাযযার : ৬১৮১; তারিখে তাবারি : ২/৫৮০; ফাতহুল বারি : ১৩/১১৯; আত-তাহরির আলাল মুখতার : ১/৬৮

[17] সহিহ বুখারি : ৬৭৩০; সহিহ মুসলিম : ১৭৩৩

[18] আল-ইতিসাম : ২/১২৬

[19] নিহায়াতুল মুহতাজ : ৭/৪০৯

[20] আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল : ১/১৫৩

[21] ফাজায়িহুল বাতিনিয়্যাহ : ১৯১

[22] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ১/৫

[23] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবু ইয়ালা : ২০

[24] এর ব্যাখ্যা পরে আসছে।

[25] শরহু সহিহ মুসলিম, নববি : ১২/২০৫

[26] আল-গিয়াসি : ৫২

[27] আল-গিয়াসি : ৫৬

[28] সহিহ বুখারি : ৬৮৩০

[29] আল-মুসান্নাফ, ইবনু আবি শায়বা : ৩২৮৬৮; মুসনাদু আহমাদ : ৩৯১

[30] ফাতহুল বারি : ১২/১৫৪

[31] আল-আকহামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ১০

[32] সহিহ বুখারি : ৭২১৮

[33] আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, মাওয়ারদি : ২৫

[34] মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া : ১/১৪২

[35] মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনু তাইমিয়া : ১/৫৩২

[36] সহিহ বুখারি : ৬৯৩; রাওজাতুত তালিবিন, নববি : ১০/৪৬

[37] মুগনিল মুহতাজ, নববি : ৪/১৩০; কাশশাফুল কিনা, বাহুতি : ৬/১৫৯

[38] তাহরিরুল আহকাম ফি তাদবিরি আহলিল ইসলাম, ইবনু জামাআহ : ১/৫৭

[39] সুরা মায়িদা : ২

[40] সুরা আলে ইমরান : ১০৩

[41] সুরা শুরা : ১৩

[42] সুরা হাদিদ : ২৫

[43] মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩৫/৩৬

[44] সুনানুদ দারিমি : ২৫৩

[45] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/৩৯০

[46] মাজমুউল ফাতাওয়া : ১১/৯২

[47] সহিহ বুখারি : ৪২৬২

[48] সহিহ বুখারি : ৪২৬১

[49] ফাতহুল বারি : ৬/১৮০

[50] সহিহ মুসলিম : ১৯২২

[51] সহিহ মুসলিম : ১৯২৪

[52] মুসনাদু আহমাদ : ২১১৩৯

[53] মুসনাদু আহমাদ : ১৮৪০৬

[54] আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল-ফিতান : ৪২০

[55] সুরা আনফাল : ৪৬

[56] সহিহ বুখারি : ৭০৫৪; সহিহ মুসলিম : ১৮৪৯

[57] সহিহ বুখারি : ৩৪৫৫; সহিহ মুসলিম : ১৮৪২

[58] সহিহ মুসলিম : ১৮৫১

[59] সহিহ বুখারি : ৭০৮৪; সহিহ মুসলিম : ১৮৪৭

[60] মাজমুউল ফাতাওয়া : ২৮/১৯-২০

[61] সুরা মায়িদা : ১; সুরা ইসরা : ৩৪

******

আপনাদের নেক দু'আয় মুজাহিদীনে কেরামকে ভুলে যাবেন না।